তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং বাংলাদেশ

ইউনিট 1

ভূমিকা

মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তার চিন্তা ও চেতনাকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে আসছে। আর এই প্রয়াস থেকেই এমন অনেক কিছু আবিষ্কার হয়েছে যা পৃথিবীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। তার মধ্যে কম্পিউটার অন্যতম। কম্পিউটার মানুষের চিন্তা ও চেতনার অন্যতম ফসল এবং এটা মানুষের আগ্রহের বিষয়বস্তু বটে। কম্পিউটার আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানে একটি নতুন ক্ষেত্র সংযোজিত হয়েছে। তার সাথে উন্মুক্ত হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এক নতুন জগৎ। আমাদের দেশেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এক জোয়ার সৃষ্টি করেছে। বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তর ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর সর্বক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা একান্ত অপরিহার্য।

এই ইউনিটে একুশ শতকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশে ই-লার্নিং, ই-গভর্ন্যান্স, ই-সার্ভিস ও ই-কমার্স, বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে আইসিটি, সামাজিক যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি, বিনোদনক্ষেত্রে আইসিটি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১.১ : একুশ শতকে যোগাযোগ প্রযুক্তি।

পাঠ - ১.২ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

পাঠ - ১.৩ : বাংলাদেশে ই-লার্নিং ও ই-গভর্ন্যান্স।

পাঠ - ১.৪ : বাংলাদেশে ই-সার্ভিস ও ই-কমার্স।

পাঠ - ১.৫ : বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে আইসিটি।

পাঠ - ১.৬ : সামাজিক যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি।

পাঠ - ১.৭ : ডিজিটাল বাংলাদেশ।

পাঠ-১.১ একুশ শতকে যোগাযোগ প্রযুক্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- Globalization ও Internationalization কি বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	Globalization, Internationalization, ইন্টারনেট, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ।

একুশ শতক হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। পূর্বে সম্পদের যে ধারণা ছিল, বর্তমানে সেটি পুরোপুরি পাল্টে গেছে। পৃথিবীর সবাই মেনে নিয়েছে যে, জ্ঞানই হচ্ছে একুশ শতকের সম্পদ। যার অর্থ কৃষি, খনিজ সম্পদ, শিল্প কিংবা বাণিজ্য নয়; বর্তমানে পৃথিবীর সম্পদ হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তার কারণ একমাত্র মানুষই জ্ঞান সৃষ্টি করতে পারে, জ্ঞান ধারণ করতে পারে এবং জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে। সম্পদের এই নতুন ধারণাটি পুরো পৃথিবীর মানুষের চিন্তার জগতে একটি বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে। একুশ শতকের মানুষ তাই সম্পূর্ণ নতুনভাবে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

একুশ শতকের পৃথিবীটা আসলে জ্ঞানভিত্তিক একটা অর্থনীতির উপর দাঁড়াতে শুরু করেছে। একুশ শতকে এসে দুটি নতুন বিষয়ের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে- যার একটি হচ্ছে Globalization, অন্যটি হচ্ছে Internationalization। এই দুটি বিষয় ত্বরান্বিত হওয়ার পেছনের কারণটি হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। ভৌগোলিক সীমানা এখন আর যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন বাধা নয়। বিশ্বায়নের কারণে দেশের সীমা এখন নিজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে আজ নতুন এক পৃথিবী গড়ে উঠেছে যেখানে সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যোগাযোগ কার্যক্রম অনেক সহজ হয়েছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যোগাযোগের জন্য বাস্তবে অনেক দূরত্ব থাকলেও ইন্টারনেট সেই দূরত্বকে একেবারেই কমিয়ে দিয়েছে। এই দ্রুত গতির প্রযুক্তি নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলেই মানুষ বিশ্বের যে কোন প্রান্তের খবর মুহূর্তের মধ্যেই জানতে পারছে এবং তাদের মতামত বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারছে।

এক সময় বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে প্রকৃতির অনুকম্পার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হতো। বিভিন্ন যন্ত্র আবিষ্কার করে মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনেছে। অষ্টাদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের পর মানুষ যন্ত্রের উপর নির্ভর করে পৃথিবীর অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। যে সকল জাতি শিল্প বিপ্লবে অংশ নিয়েছিল, এক সময় তারাই পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। একুশ শতকে যখন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির সূচনা হয়েছে, তখন আবার সেই একই ব্যাপার ঘটছে। যারা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরি করার বিপ্লবে অংশ নেবে তারাই পৃথিবীর চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হবে। একুশ শতকের এই বিপ্লবে অংশ নিতে হলে প্রয়োজন বিশেষ প্রস্তুতির। বেঁচে থাকার যে সুনির্দিষ্ট দক্ষতাগুলো এই শতকে প্রয়োজন সেগুলো হবে পাস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব, যোগাযোগ দক্ষতা, সুনাগরিকত্ব, সমস্যা সমাধানে পারদর্শিতা, বিশ্লেষণী চিন্তণ দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং তার সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পারদর্শিতা। সত্যি কথা বলতে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পারদর্শিতা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা হিসেবে খুব দ্রুত স্থান করে নিচ্ছে। একুশ শতকে টিকে থাকতে হলে সবাইকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রাথমিক বিষয়গুলো জানতে হবে। এই প্রাথমিক বিষয়গুলো জানা থাকলেই একজন এটি ব্যবহার করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিশাল বৈচিত্র্যের জগতে নিজের অবস্থান তুলে ধরতে পারবে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা না শিখলে, অভ্যস্ত না হলে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সংযোজন, মূল্যায়ন করে নতুন তথ্য সৃষ্টি করতে পারবে না। ফলে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজে নিজের স্থান করে নিতে পারবে না।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই বইটি শিক্ষার্থীদের একুশ শতকের দক্ষ নাগরিক হওয়ার জন্য প্রাথমিক দিক নির্দেশনা দিবে। তবে মনে রাখতে হবে এই পাঠ্যবই এবং শ্রেণিকক্ষ শুধু নতুন পৃথিবীর দক্ষ নাগরিক হওয়ার একটি ক্ষুদ্র অংশ। শিক্ষার্থীকে অবশ্যই এই পাঠ্যবই এবং শ্রেণিকক্ষের গণ্ডি পার হতে হবে। দিক নির্দেশনাটুকু নিয়ে তাদেরকে নিজের মতো করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জগতে প্রবেশ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	একুশ শতকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবস্থান সম্পর্কে মতামত তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

জ্ঞানই হচ্ছে একুশ শতকের সম্পদ। একুশ শতকের পৃথিবী জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির উপর দাঁড়াতে শুরু করেছে। একুশ শতকে এসে দুটি নতুন বিষয়ের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে- এগুলো হচ্ছে- Globalization এবং Internationalization । তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে আজ নতুন এক পৃথিবী গড়ে উঠেছে যেখানে সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যোগাযোগ কার্যক্রম অনেক সহজ হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. জ্ঞান ভিত্তিক অর্থনীতির সূচনা ঘটেছে কোন শতকে?

ক. উনবিংশ শতকে খ. একুশ শতকে
গ. অষ্টাদশ শতকে ঘ. পনেরশ শতকে

২. একুশ শতকে কোন বিষয়ের সাথে পরিচয় হয়েছে ?

i. Globalization
ii. Internationalization
iii. Civilization
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. একুশ শতকের মূল চালিকা শক্তি কোনটি?

ক. অর্থনৈতিক উন্নয়ন খ. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার
গ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঘ. বিশ্বায়ন

৪. একুশ শতকের অর্থনীতি কোনটির উপর নির্ভরশীল?

ক. জ্ঞান খ. যন্ত্র
গ. শক্তি ঘ. ইচ্ছা

পাঠ-১.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে বিভিন্ন ব্যক্তির অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	চার্লস ব্যাবেজ, অ্যাডা লাভলেস, জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, জগদীশ চন্দ্র বসু, গুগলিয়েলমো মার্কনি, রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন, স্টিভ জবস, বিল গেটস, স্যার টিমোথি জন বার্নাস-লি, মার্ক জুকারবার্গ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্তারের পিছনে রয়েছে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও গবেষণার ফলাফল, রয়েছে অনেক বিজ্ঞানী, ভিশনারি, প্রকৌশলী এবং নির্মাতাদের অবদান। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রযুক্তির অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কম্পিউটারের উদ্ভাবন, তার এবং তারহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা, মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্সের ব্যবহার বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে এসেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে বর্তমান অবস্থানে নিয়ে আসতে যাদের অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে এই পাঠে আলোচনা করা হয়েছে।

চার্লস ব্যাবেজ :

চিত্র ১.২.১ : চার্লস ব্যাবেজ

প্রযুক্তির ইতিহাসের অন্যতম এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের নাম চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage) [১৭৯১-১৮৭১]। তিনি ছিলেন একাধারে গণিতবিদ, দার্শনিক, আবিষ্কারক এবং যন্ত্র প্রকৌশলী। তাঁকে কম্পিউটারের জনক বলা হয়। তিনি ডিফারেন্স ইঞ্জিন ও এনালিটিক্যাল ইঞ্জিন নামের দুইটি গণনা যন্ত্র তৈরি করেন। প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্র সেই সময় সাফল্যের সাথে কাজ করতে পারেনি। তবে ১৯৯১ সালে তাঁর ডিজাইন থেকেই সফলভাবে কর্মক্ষম একটি যন্ত্র তৈরি করা হয়। এ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, চার্লসের দুটি ইঞ্জিনই গণনার কাজ করতে পারত।

অ্যাডা লাভলেস :

চিত্র ১.২.২ :অ্যাডা লাভলেস

গণনার কাজটি কিভাবে আরো কার্যকর করা যায় সেটি নিয়ে ভেবেছিলেন কবি লর্ড বায়রনের কণ্যা অ্যাডা লাভলেস (Ada Lovelace) [১৮১৫-১৮৫২]। মায়ের কারণে অ্যাডা ছোটবেলা থেকে বিজ্ঞান ও গণিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮৩৩ সালে চার্লস ব্যাবেজের সাথে তার পরিচয় হয়। ব্যাবেজের নতুন ধ্যান-ধারণাকে মাত্র যে গুটি কয়েকজন বুঝতে পেরেছিলেন তন্মধ্যে অ্যাডা অগ্রগণ্য। তিনি ব্যাবেজের এনালিটিক্যাল ইঞ্জিনকে কাজে লাগানোর জন্য ''প্রোগ্রামিং'' এর ধারণা দেন। এ কারণে অ্যাডা লাভলেসকে ''প্রোগ্রামিং'' ধারণার প্রবর্তক হিসেবে সম্মানিত করা হয়। ১৮৪২ সালে ব্যাবেজ তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ইঞ্জিন সম্পর্কে বক্তব্য দেন। অ্যাডা সে সময় ব্যাবেজের সহায়তায় পুরো বক্তব্যে ইঞ্জিনের কাজের ধারাটি বর্ণনা করেন। কাজের ধারা বর্ণনার সময় তিনি এটি ধাপ অনুসারে ক্রমাঙ্কিত করেন। অ্যাডার মৃত্যুর ১০০ বছর পর ১৯৫৩ সালে সেই নোট আবারো প্রকাশিত হলে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, অ্যাডা আসলে অ্যালগরিদম প্রোগ্রামিংয়ের ধারণাটাই প্রকাশ করেছিলেন।

[Photo credit: www.wikipedia.org]

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল :

ব্যাবেজ আর অ্যাডার কার্যক্রমের পাশাপাশি পদার্থবিজ্ঞানেও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়। বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল [১৮৩১-১৮৭৯] তড়িৎ চৌম্বক বলকে একত্র করে তড়িৎ চৌম্বকীয় বলের ধারণা প্রকাশ করেন, যা কিনা বিনা তারে বার্তা প্রেরণের একটি সম্ভাবনা উন্মোচন করে।

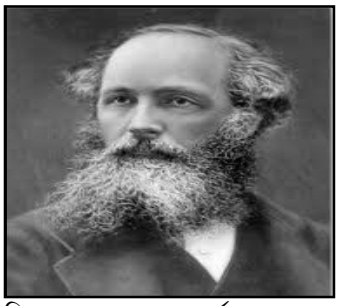

চিত্র ১.২.৩: জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল

জগদীশ চন্দ্র বসু :

জগদীশ চন্দ্র বসু [১৮৫৮-১৯৩৭] ছিলেন একজন বাঙালি পদার্থবিদ, উদ্ভিদবিদ ও জীববিজ্ঞানী। তাঁর গবেষণা উদ্ভিদবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তোলে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবহারিক ও গবেষণাধর্মী বিজ্ঞানের সূচনা করে। বিনা তারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বার্তা প্রেরণে প্রথম সফল হন তিনি। ১৮৯৫ সালে জগদীশ চন্দ্র বসু অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ ব্যবহার করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তথ্য প্রেরণে সফল হন। ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার্স তাকে রেডিও বিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত করেন।

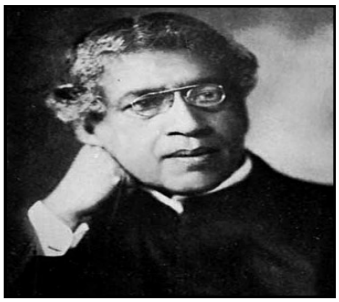

চিত্র ১.২.৪ : জগদীশ চন্দ্র বসু

গুগলিয়েলমো মার্কনি

একই সময় বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে একই কাজে প্রথম সফলতা লাভ করে ইতালির বিজ্ঞানী গুগলিয়েলমো মার্কনি [১৮৭৪-১৯৩৭]। এজন্য তাঁকে বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

চিত্র ১.২.৫ : গুগলিয়েলমো মার্কনি

রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন

ষাট-সত্তরের দশকে ইন্টারনেট প্রটোকল ব্যবহার করে আরপানেটের (ARPANET) জন্ম হয়। তখন থেকে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কম্পিউটারসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বিকশিত হতে শুরু করে। এর ফলেই পরবর্তীতে তৈরি হয় ইন্টারনেট। ১৯৭১ সালে আমেরিকান প্রোগ্রামার রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন [১৯৪১-২০১৬] আরপানেট (ARPANET) সিস্টেম ব্যবহার করে প্রথম ই-মেইল সিস্টেম চালু করেন। এজন্য তিনি @ চিহ্ন ব্যবহার করেন যা এখন পর্যন্ত ই-মেইল অ্যাড্রেসে ব্যবহার হয়ে আসছে।

চিত্র ১.২.৬: রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন

স্টিভ জবস

স্টিভ জবস [১৯৫৫-২০১১] যুক্তরাষ্ট্রের একজন উদ্যোক্তা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবক। তাঁকে পার্সোনাল কম্পিউটার বিপ্লবের পথিকৃৎ বলা হয়। তিনি ও তাঁর দুই বন্ধু স্টিভ ওজনিয়াক এবং রোনাল্ড ওয়েন ১৯৭৬ সালের ১লা এপ্রিল অ্যাপল কম্পিউটার নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। অ্যাপলের হাতেই পার্সোনাল কম্পিউটারের নানান পর্যায় বিকশিত হয়েছে।

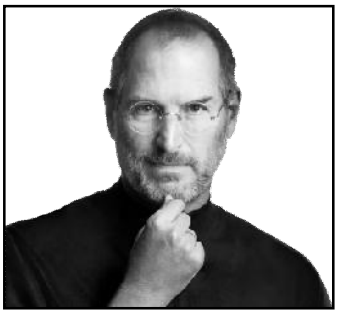

চিত্র ১.২.৭ : স্টিভ জবস

[Photo credit: www.wikipedia.org]

উইলিয়াম হেনরি বিল গেটস

চিত্র ১.২.৮ :উইলিয়াম হেনরি বিল গেটস

১৯৭৫ সালে উইলিয়াম হেনরি বিল গেটস [জন্ম অক্টোবর ২৮, ১৯৯৫] ও তাঁর বন্ধু পল এলেন মাইক্রোসফ্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮০ সালে আইবিএম কোম্পানি তাদের বানানো পার্সোনাল কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করার জন্য মাইক্রোসফ্টকে দায়িত্ব দেয়। বিকশিত হয় এমএসডস (MSDOS-Microsoft Disk Operating System) এবং উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ কম্পিউটার বিল গেটস প্রতিষ্ঠিত মাইক্রোসফ্টের অপারেটিং সিস্টেম সফ্টওয়্যার দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

স্যার টিমোথি জন বার্নাস-লি

চিত্র ১.২.৯ :স্যার টিমোথি জন বার্নাস-লি

ইন্টারনেটের বিকাশকালে ১৯৮৯ সালে ব্রিটিশ কম্পিউটার বিজ্ঞানী স্যার টিমোথি জন বার্নাস-লি [জন্ম জুন ৮, ১৯৫৫] হাইপারটেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল (HTTP-Hyper Text Transfer Protocal) ব্যবহার করে তথ্য ব্যবস্থাপনার প্রস্তাব করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন। সেই থেকে বার্নাস লি ওয়ার্ল্ড ওয়েবের (WWW-World Wide Web) জনক হিসেবে পরিচিত। নেটওয়ার্ক প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বিশ্বের নানান দেশের মধ্যে ইন্টারনেট বিস্তৃত হয়। ইন্টারনেটকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন ধরণের এ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার বিকশিত হয়।

মার্ক জুকারবার্গ :

চিত্র ১.২.১০ : মার্ক জুকারবার্গ

[Photo credit: www.wikipedia.org]

মার্ক জুকারবার্গ [জন্ম ১৪ মে, ১৯৮৪] একজন আমেরিকান কম্পিউটার প্রোগ্রামার ও সফ্টওয়্যার ডেভেলপার। যার আসল পরিচিতি হল জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট ফেইসবুক এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায় মার্ক জুকারবার্গ ও তাঁর কয়েকজন সহপাঠী মিলে ২০০৪ সালে ফেইসবুক প্রতিষ্ঠা করেন। শুরুতে এটি কেবল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীতে এটি সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়। সারা বিশ্বে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করছেন এবং এ সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি দল গঠনপূর্বক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তির অবদান আলোচনা করে তা উপস্থাপন করুন।

সারসংক্ষেপ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্তারের পিছনে রয়েছে যুগ যুগ ধরে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও গবেষণার ফলাফল, রয়েছে অনেক বিজ্ঞানী, ভিশনারি, প্রকৌশলী এবং নির্মাতাদের অবদান। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ব্যক্তিবর্গ হলেন- চার্লস ব্যাবেজ, অ্যাডা লাভলেস, জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, জগদীশ চন্দ্র বসু, গুগলিয়েলমো মার্কনি, রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন, স্টিভ জবস, উইলিয়াম হেনরি বিল গেটস, স্যার টিমোথি জন বার্নাস লি এবং মার্ক জুকারবার্গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আধুনিক কম্পিউটারের জনক কে?

ক. মার্ক জুকারবার্গ খ. চার্লস ব্যাবেজ
গ. অ্যাডা লাভলেস ঘ. স্টিব জবস

২. প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক কে?

ক. চার্লস ব্যাবেজ খ. টিম বার্নাস লি
গ. অ্যাডা লাভলেস ঘ. মার্ক জুকারবার্গ

৩. অ্যাডা লাভলেসের মৃত্যুর কত বছর পর তাঁর নোট আবারও প্রকাশিত হয়?

ক. ৫০ বছর খ. ১০০ বছর
গ. ১১০ বছর ঘ. ১৪০ বছর

পাঠ-১.৩ বাংলাদেশে ই-লার্নিং ও ই-গভর্ন্যান্স

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ই-লার্নিং ও ই-গভর্ন্যান্স সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- শিক্ষাক্ষেত্রে ই-লার্নিং এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে ই-লার্নিং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে ই-গভর্ন্যান্সের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ইলেকট্রনিক লার্নিং, ইন্টারনেট, মুক্তপাঠ, শিক্ষক ডট কম, জাগো অনলাইন স্কুল, টেন মিনিট স্কুল, ডিজিটাল ব্যবস্থা, তথ্যের ডিজিটালকরণ।

ই-লার্নিং

বর্তমান সময়ে ই-লার্নিং খুবই আলোচিত বিষয়। দেশে কিংবা বিদেশে সবখানেই এর জয়জয়কার। ধরাবাঁধা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে কিছুটা ভিন্ন হওয়ায় দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই শিক্ষা ব্যবস্থাটি। দিন দিন প্রযুক্তি উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। আর এরই সাথে পাল্লা দিয়ে বদলে যাচ্ছে অনেক কিছু । শিক্ষা ব্যবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। ইন্টারনেট আর কম্পিউটারের হাত ধরে এখানে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। জ্ঞানার্জনের বিষয়টি এখন আর দুই মলাটের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই। একটি কম্পিউটার আর সাথে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে যে কোন জায়গায় বসেই বিভিন্ন বিষয়ের উপর আজকাল সহজেই দক্ষতা অর্জন করা যায়।

ই-লার্নিং শব্দটি ইলেকট্রনিক লার্নিং কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। মূলত প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি ক্লাস করা কিংবা কোন বিষয়ের উপর জ্ঞানার্জন করার পদ্ধতিই ই-লার্নিং নামে পরিচিত। এ পদ্ধতিতে ঘরে বসে সুবিধাজনক সময়ে পছন্দ মতো বিষয়ে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তোলা সম্ভব। যেহেতু এখানে ধারাবাঁধা ক্লাসের ব্যাপারটি থাকে না, তাই সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজটি চালিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে।

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী বিশাল। দিন দিন জনসংখ্যা বেড়েই চলছে। স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যাও সে কারণে দিন দিন বাড়ছে। নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে আমাদের স্কুলগুলোতে দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। লেখাপড়ার জন্য দরকারী সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ল্যাবরেটরি অপ্রতুল, ফলে হাতে-কলমে বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ খুব কম। এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ই-লার্নিং বড় ভূমিকা রাখতে পারে। দক্ষ একজন শিক্ষকের পাঠদান ভিডিও করে নিয়ে সেটি অসংখ্য স্কুলে বিতরণ করা যেতে পারে। একজন শিক্ষক প্রয়োজনে নিজেই তার পাঠদান সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় তৈরি করতে পারেন এবং সেটি বারবার ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও অর্থের অভাবে কিংবা পারিপার্শ্বিক কারণে অনেক শিক্ষার্থীই মাঝপথে লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হয়। দেশের অনেক অঞ্চলেই এখনও সেভাবে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এ সকল স্থানে ই-লার্নিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সারা পৃথিবীতেই ই-লার্নিংয়ের জন্য নানা উপকরণ তৈরি হতে শুরু করেছে। পৃথিবীর বড় বড় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অসংখ্য কোর্স অনলাইনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং যে কেউ সেই কোর্সগুলোতে ভর্তি হতে পারে। এমনকি একজন একটি কোর্স নেওয়ার পর প্রয়োজনীয় অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়ে কিংবা অনলাইনে পরীক্ষা দিয়ে সেই কোর্সটি সম্পূর্ণ করতে পারছে।

ই-লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই বাংলাদেশও। বর্তমানে আমাদের দেশেও রয়েছে একাধিক ই-লার্নিং কার্যক্রম। বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তিবিদরা বাংলায় কোর্স দেবার জন্য বেশ কিছু ওয়েবসাইট পোর্টাল তৈরি করেছেন এবং সারা পৃথিবী থেকে যে কেউ বাংলা ভাষায় সেই কোর্সগুলো গ্রহণ করতে পারেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মুক্তপাঠ, শিক্ষক ডট কম, জাগো অনলাইন স্কুল, টেন মিনিট স্কুল প্রভৃতি।

বাংলাদেশে উত্তম পাঠদানের সীমাবদ্ধতা দূর করার ব্যাপারে ই-লার্নিং অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারলেও দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠদানের সময় একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের সরাসরি দেখতে পারে ও বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করতে পারে। তেমনি শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকের সাথে সরাসরি নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারে ও ভাববিনিময় করতে পারে। মূলত ই-লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো অনুপস্থিত থাকায় পদ্ধতিটা যান্ত্রিক বলে মনে হতে পারে। তাই ই-লার্নিংয়ের মাধ্যমে কোন কোর্স করতে হলে শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি উদ্যোগী হতে হবে।

বাংলাদেশে ই-লার্নিংয়ের অনেক বড় সুযোগ রয়েছে। সেজন্য ইন্টারনেটের স্পীড, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং ই-লার্নিংয়ের শিখন সামগ্রীগুলো তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে।

ই-গভর্নেন্স

ই-গভর্নেন্স (E-governence) এর পূর্ণরূপ হলো- ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স (Electronic Governence)। এটা এমন একটি পদ্ধতি বা ব্যবস্থা যা সরকারের কর্মকান্ড ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাইজড আকারে রূপান্তরিত করে এবং জনগণের সাথে সরকারের সরাসরি যোগসূত্র স্থাপন করে। ডিজিটাইজড ইনফরমেশন তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শেয়ার করতে পারে।

সরকারী কার্যক্রমে ও প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগই হচ্ছে ই-গভর্ন্যান্স। অতীতে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বিশেষ করে এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করা পরীক্ষার্থী এবং অবিভাবকদের একটি বিড়ম্বনা ব্যাপার ছিল। কিন্তু বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট এমনকি মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে ফলাফল জানা যায়। আবার পরীক্ষার ফলাফল পুন:মূল্যায়ন করার জন্যও এখন অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করা হচ্ছে এবং ফলাফল অতিদ্রুত পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্সের আর একটি উদাহরণ হলো কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ভর্তির ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন। শিক্ষার্থীদের এখন আর কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। শিক্ষার্থী যে কোন স্থান হতে তার পছন্দের কলেজে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারছে। এমনকি মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমেও শিক্ষার্থীরা ভর্তির আবেদন করতে পারছে।

বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে এবং অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন জমা নেওয়া হচ্ছে এবং ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে।

তথ্যের ডিজিটালকরণের ফলে বর্তমানে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সকল সেবা স্বল্প সময়ে, কম খরচে এবং ঝামেলাহীনভাবে পাওয়া যায়। আগে যেখানে কোন কোন সেবা পেতে ২/৩ সপ্তাহ লাগতো, সেটি এখন মাত্র ২-৫ দিনে পাওয়া যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তথ্যের ডিজিটালকরণের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ৮০-৯০ শতাংশ সময় কম লাগছে। সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন দলিল, পর্চা প্রভৃতির নকল প্রদানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সক্ষমতাও ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নাগরিক যন্ত্রণার আর একটি উদাহরণ হলো পরিসেবাসমূহের বিল পরিশোধ। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদির বিল পরিশোধের গতানুগতিক পদ্ধতি খুবই সময়সাপেক্ষ এবং যন্ত্রণাদায়ক, কোন কোন ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ কর্মময় দিন বিদ্যুৎ বিল অথবা গ্যাস বিল পরিশোধেই ব্যয় হয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে মোবাইল ফোন কিংবা অনলাইনে এই বিল পরিশোধ করা যায়। ই-গভর্ন্যান্সের মূল বিষয় হলো নাগরিক জীবনমান উন্নত করা এবং হয়রানি মুক্ত রাখা। ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে কোন কোন কার্যক্রমের সময় ২৪×৭×৩৬৫ দিনে পরিণত করা যায়। ফলে, নাগরিকরা নিজেদের সুবিধাজনক সময়ে সেবা গ্রহণ করতে পারে।

বাংলাদেশে ই-গভর্ন্যান্স চালুর ফলে সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে আন্ত:সংযোগসহ কর্মীদের দক্ষতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দ্রুত সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। তবে এখনও অনেক ক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্স চালু হাওয়ার বাকি রয়েছে। সকল ক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্স চালু হলে দেশ আরও অনেক উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ই-লার্নিং ও ই-গভর্ন্যান্স এর সুবিধাসমূহ নিয়ে পোস্টার ডিজাইন করে উপস্থাপন করুন।

সারসংক্ষেপ

বর্তমান সময়ে ই-লার্নিং খুবই আলোচিত বিষয়। ই-লার্নিং শব্দটি ইলেকট্রনিক লার্নিং কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। মূলত প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি ক্লাস করা কিংবা কোন বিষয়ের উপর জ্ঞানার্জন করার পদ্ধতিই ই-লার্নিং নামে পরিচিত। আর সরকারী কার্যক্রমে ও প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগই হচ্ছে ই-গভর্ন্যান্স।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ই-লার্নিং এর পূর্ণরূপ কি?

ক. ইলেকট্রনিক লার্নিং খ. ইলেকট্রো লার্নিং
গ. ইলেকট্রিক লার্নিং ঘ. ইলেকট্রোন লার্নিং

২. বাংলায় কোর্স দেওয়ার ওয়েবসাইট হলো-

i. মুক্তপাঠ
ii. শিক্ষক ডট কম
iii. টেন মিনিট স্কুল
কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. শাসন ব্যবস্থায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগকে কি বলে?

ক. ই-লার্নিং খ. ই-সার্ভিস
গ. ই-গভর্ন্যান্স ঘ. ই-কমার্স

পাঠ-১.৪ বাংলাদেশে ই-সার্ভিস ও ই-কমার্স

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ই-সার্ভিস ও ই-কমার্স কি তা বলতে পারবেন।
- বাংলদেশে ই-সার্ভিসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ই-কমার্সের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কুইক-উইন, ই-পর্চা, ইএমটিএস, ই-পুর্জি, ই-স্বাস্থ্যসেবা, ই-টিকেটিং, মোবাইল টিকেটিং।

ই-সার্ভিস

ই-সার্ভিস এর পূর্ণরূপ হলো ইলেকট্রনিক সার্ভিস। বর্তমানে ই-সার্ভিস বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি সেবামূলক সংস্থা সার্বক্ষণিকভাবে অথবা স্বল্প সময়ে দেশের জনগণকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে। কুইক-উইন, ই-পর্চা, ইএমটিএস, ই-পুর্জি, ই-স্বাস্থ্যসেবা, ই-টিকেটিং এই সেবার অর্ন্তভুক্ত। ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ার পূর্বে এসব সেবার ক্ষেত্রে জনগণকে অনেক হয়রানির শিকার হতে হতো। কিন্তু ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা গ্রহণকারীরা যে কোন স্থানে বসেই মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের ই-সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। উদাহরণ হিসেবে ঢাকা থেকে রংপুর যাওয়ার জন্য কোনো আন্ত:নগর ট্রেনের টিকেট কাটার কথা বিবেচনা করা যায়। ট্রেনের টিকিট সংগ্রহ করার জন্য যাত্রীকে রেল স্টেশনে টিকিট সংগ্রহের লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে টিকিট সংগ্রহ করতে হয়; যা অনেক সময় ক্ষেপণ এবং ঝামেলাপূর্ণ ও বিরক্তিকর। বর্তমানেও এ ধরণের সিস্টেম চালু থাকলে মানুষ অতি সহজেই ও অল্প সময়েই ই-সার্ভিসের মাধ্যমে টিকিট সংগ্রহের কাজটি করতে পারছে; যা ই-টিকিট বা অনলাইন টিকিট সিস্টেম নামে পরিচিত। ই-সেবার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি স্বল্প সময়ে হয়রানিমুক্ত সেবা নিশ্চিত করে। প্রথমে 'কুইক-উইন' বা সহজে বাস্তবায়নযোগ্য উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তর নিজস্ব উদ্যোগে বৃহৎ পরিসরে ই-সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বেশিরভাগ নাগরিক কোন না কোন ই-সেবা উপভোগ করছে। এসব উদ্যোগের ফলে দেশে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ই-সেবা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো-

ই-পর্চা সেবা : সাধারণত জমি বা ভূমি সংক্রান্ত যে কোন ধরনের তথ্য জমির রেজিস্ট্রি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হয়। যা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং তুলনামূলক ব্যয়বহুল। জমির রেজিস্ট্রি অফিসের কাজ শেষ করে আসা কোন ব্যক্তি দ্বিতীয়বার আর জমির রেজিস্ট্রি অফিসে যেতে চায় না। এই গতানুগতিক পদ্ধতি আর ভোগান্তি কমানোর জন্য বর্তমানে চালু হয়েছে ই-পর্চা সেবা। ফলে দেশের সকল জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইন হতে সংগ্রহ করা যায়। অর্থাৎ অনলাইন হতে জমি সংক্রান্ত তথ্য, জমির রেকর্ডের অনুলিপি সংগ্রহ করার সিস্টেমই হলো ই-পর্চা। বর্তমানে জমি সংক্রান্ত তথ্যাদি ই-সেবার আওতায় আসায় আবেদনকারী এখন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের জেলা ই-সেবা কেন্দ্রের পাশাপাশি, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে এমনকি অনলাইনে দেশ-বিদেশের যে কোন স্থান থেকেই নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে পর্চা সংগ্রহ করতে পারছে।

ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম (ইএমটিএস) : বাংলাদেশে ডাক বিভাগের ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফারের সনাতন সিস্টেম সম্পর্কে কম-বেশি অনেকেই অবগত। এই সনাতন পদ্ধতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ লেনদেনে প্রক্রিয়াটি ছিল সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এই ধরনের সমস্যার সমাধানের জন্য বর্তমানে বাংলাদেশের ডাক বিভাগে চালু হয়েছে ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম (ইএমটিএস)। এই সিস্টেমের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিরাপদে দ্রুত ও কম খরচে অর্থ আদান-প্রদান করা যায়। বর্তমানে দেশের প্রায় সকল পোস্ট অফিস ও সাবপোস্ট অফিস থেকে এই ই-সেবার মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১ (এক) মিনিটের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পাঠানো সম্ভব।

ই-পুর্জি : দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত চিনিকলসমূহের তথ্য এখন ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ চিনিকলসমূহের তথ্য ইলেকট্রনিক উপায়ে আখচাষি বা অন্যদের কাছে সরবরাহের পদ্ধতিই হলো ই-পুর্জি। আখচাষিরা এই ই-সেবা ব্যবহার করে দেশের ১৫টি চিনিকলের তথ্য এসএমএসের মাধ্যমে পাচ্ছে। ই-পুর্জির মাধ্যমেই আখচাষিরা জানতে পারছে চিনিকলসমূহে কখন আখ সরবরাহ করবে, কখন তাদের কাছ থেকে অনুমতিপত্র গ্রহণ করতে হবে ইত্যাদি। ফলে আখচাষিদের দীর্ঘদিনের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান হয়েছে। পাশাপাশি সঠিক সময়ে আখ সরবরাহের ফলে চিনিকলের উৎপাদনও বাড়ছে।

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র : কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র হলো-মাঠপর্যায়ে স্থাপিত কৃষকদের দ্বারা পরিচালিত একটি আইসিটিভিত্তিক তথ্য সেবা কেন্দ্র। এই ই-সেবার মাধ্যমে কৃষকরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে তথ্যসেবা গ্রহণ ও বিতরণের কাজটি করতে সক্ষম হচ্ছেন। এছাড়াও কৃষিবিষয়ক পরামর্শ গ্রহীতাদের অনলাইনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

জাতীয় ই-তথ্যকোষ : জীবন-জীবিকাভিত্তিক সকল তথ্য যেন সহজেই এক জায়গায় খুঁজে পাওয়া যায় সেজন্য বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম তথ্যকোষ জাতীয় ই-তথ্যকোষ চালু করা হয়েছে। জাতীয় ই-তথ্যকোষে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন ও মানবাধিকার, পর্যটন, কর্মসংস্থান, শিল্প ও বাণিজ্য, নাগরিক সেবা, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য টেক্সট, এ্যানিমেশন, ছবি, অডিও এবং ভিডিও আকারে বাংলা ভাষায় সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় ই-তথ্যকোষ ওয়েবসাইটের ভিডিও কন্টেন্টসমূহকে নিয়ে অ্যাপস এবং নারী উন্নয়ন ও নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক যে সেকল তথ্য রয়েছে সেগুলো নিয়ে তথ্যকোষে 'জাগরণ' নামে একটি সাব-সাইট রয়েছে।

ই-স্বাস্থ্যসেবা : মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনগণ এখন সহজেই সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসকের কাছ থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ নিতে পাচ্ছেন। এজন্য দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে একটি করে মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছে। দেশের যে কোন নাগরিক এই ই-স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে যে কোন চিকিৎসকের পরামর্শ পেতে পারেন।

টেলিমেডিসিন ও ই-হেলথ হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান। টেলিমেডিসিন প্রযুক্তিতে ইন্টারনেট সংযোগের সাহায্যে এক হাসপাতালের রোগীরা অন্য হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। এছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সিং এর সাহায্যে রোগীরা দূরে অবস্থানরত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের নিকট হতে স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারে। অর্থাৎ টেলিমেডিসিন সেবার মাধ্যমে রোগী শহরে না এসেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছেন।

রেলওয়ের ই-টিকেটিং ও মোবাইল টিকেটিং : বর্তমানে কিছু মোবাইল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোবাইল টিকেটিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ সেবার মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের কয়েকটি আন্ত:নগর ট্রেনের টিকেট জনগণ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পাচ্ছেন। এছাড়াও অনলাইনে টিকেট সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে।

ই-কমার্স

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব ব্যাপক ভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছে বিশ্ব অর্থনীতিকে। মানুষের এমন কোনো কর্মক্ষেত্র নেই যেখানে প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগেনি। বর্তমানে অফিস অটোমেশন ও ইন্টারনেট সংযোগের সহজলভ্যতা আর দ্রুততার কারণে প্রতিদিনই হচ্ছে কোটি কোটি বাণিজ্যিক লেনদেন, শেয়ার করা হয় কোটি কোটি ম্যাসেজ ও ই-মেইল। বর্তমানে ইন্টারনেট অর্থনীতির ক্রমোন্নতির চালক এবং কর্মক্ষেত্র তৈরির নিয়ামক।

ই-কমার্স এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে ইলেকট্রনিক কমার্স । ইন্টারনেট প্রযুক্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পণ্য, সেবা ও তথ্য ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর বা বিনিময় কার্যকেই বলা হয় ই-কমার্স (E-commerce)। ই-কমার্স একটি বাণিজ্য ক্ষেত্র যেখানে কোন ইলেকট্রনিক সিস্টেমের মাধ্যমে পণ্য বা সেবার লেনদেন সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। আধুনিক ই-কমার্স সাধারণত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক কাজ পরিচালনা করে। এছাড়াও মোবাইল কমার্স, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার ও অন্যান্য আরো কিছু মাধ্যম ব্যবহৃত হয়। ই-কমার্সের সুবিধাসমূহ হলো-

১. ব্যবসার মান বিশেষভাবে উন্নয়ন করা যায়।
২. ই-কমার্স কোন প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক বাজারে প্রবেশ করতে সাহায্য করে।
৩. ই-কমার্সের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন খরচাদি যেমন- তৈরী করা, বিতরণ করা, সংরক্ষণ করা এবং পড়া ইত্যাদি কার্যক্রমের খরচ ব্যাপকভাবে কমায়।
৪. ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সহজে সুসম্পর্ক তৈরী করে।
৫. ই-কমার্স সময় বাঁচায় এবং অতি দ্রুত ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছায়।
৬. যোগাযোগ খরচ কমায়।
৭. পণ্য ও সেবার মান উন্নয়ন করা যায়।

সারা বিশ্বে অনলাইন লেনদেন বাড়ার কারণে ই-কমার্স এর গতি ও আকার বড় হচ্ছে। ২০১১-১২ সাল থেকে বাংলাদেশেও ধীরে ধীরে ই-কমার্সের প্রসার শুরু হয়। বর্তমানে বই থেকে শুরু করে জামা, কাপড়, খাবার, সৌখিন সামগ্রী ইত্যাদি অনলাইনে বেচাকেনা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এক সময় হয়তো পৃথিবীর সব ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য ই-কমার্সের মাধ্যমেই পরিচালিত হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে ই-কমার্সের সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার মতামত তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

ই-সার্ভিস এর পূর্ণরূপ হলো ইলেকট্রনিক সার্ভিস। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কোন সেবা প্রদান করাকেই ই-সার্ভিস বা ই-সেবা বলা হয়। কুইক-উইন, ই-পর্চা, ইএমটিএস, ই-পুর্জি, ই-স্বাস্থ্যসেবা, ই-টিকেটিং এই সেবার অর্ন্তভুক্ত। সারা বিশ্বে অনলাইন লেনদেন বাড়ার কারণে ই-কমার্স এর গতি ও আকার বড় হচ্ছে। ই-কমার্স একটি বাণিজ্য ক্ষেত্র যেখানে কোন ইলেকট্রনিক সিস্টেমের মাধ্যমে পণ্য বা সেবার লেনদেন হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদান করার পদ্ধতিকে কি বলে?

ক. ই-সার্ভিস খ. ই-মেইল
গ. ই-কমার্স ঘ. ই-লার্নিং

২. ই-পূর্জি এর পূর্ণরূপ কী?

ক. ইলেকট্রো পূর্জি খ. ইলেকট্রন পূর্জি
গ. ইলেকট্রনিক পূর্জি ঘ. ইলেকট্রিক পূর্জি

৩. ডাক বিভাগের মাধ্যমে দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?

ক. ই-পর্চা খ. ই-পূর্জি
গ. ইএমটিএস ঘ. ই-স্বাস্থ্যসেবা

পাঠ-১.৫ বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে আইসিটি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ই-মেইল, আউটসোর্সিং।

কর্মসংস্থানের উপর আইসিটির প্রভাব নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কর্মক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়তা আনায়নে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরিতে অগ্রণি ভূমিকা পালন করছে। অর্থাৎ আইসিটির ধারণা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। প্রচলিত নিয়মে একটি দেশের একজন মানুষ কেবলমাত্র সেই দেশের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে পারে কিন্তু সেই সীমানাকে দূরীভূত করে দিয়েছে। আইসিটি ব্যবহারের ফলেই কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের আর নিজ দেশের সীমানার মধ্যে পড়ে থাকতে হচ্ছে না। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকলেই যে কেউ বিশ্বের যে কোন প্রান্তে চাকুরির জন্য আবেদন করতে পারছে।

কর্মক্ষেত্রে আইসিটির দুই ধরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে কর্মক্ষেত্রগুলোতে আইসিটির ব্যবহারের ফলে কর্মদক্ষতার বৃদ্ধি এবং বাজার সম্প্রসারণ, অন্যটি হচ্ছে আইসিটির প্রভাবে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি । কর্মক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারের ফলে কর্মীদের দক্ষতা, জবাবদিহি এবং স্বচ্ছতা বেড়েছে। অন্যদিকে এর ফলে সেবার মানও উন্নত হয়েছে। বর্তমান সময়ে আইসিটির ব্যবহারের উপর পারদর্শিতা চাকুরি নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্যাংক, বিমা থেকে শুরু করে বহুজাতিক কোম্পানি, সরকারি দপ্তরে কাজ করার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ই-মেইল করা, নানান ধরণের বিশ্লেষণী সফ্টওয়্যার ব্যবহার ইত্যাদিতে দক্ষ হতে হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্বব্যাপি কর্মসংস্থানের বাজার হয়েছে উন্মুক্ত। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই যে কোন দেশের লোকজন বিশ্বের যে কোন দেশের কাজকর্ম করতে পারছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপি এ ধরনের কাজ করে অর্থ অর্জন করার প্রক্রিয়াই হল আউটসোর্সিং। ওয়েবসাইট উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, মাসিক বেতন-ভাতার বিল প্রস্তুতকরণ, ওয়েবসাইটে তথ্য যোগ করা, সফ্টওয়্যার তৈরি, বিভিন্ন কাজের জন্য ডিজাইন তৈরি, লোগো ডিজাইন, আর্টিকেল লেখা, অনুবাদ, ডাটা এন্ট্রি ইত্যাদি কাজ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে করা যায়। আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে এখন অনেকেই ঘরে বসে তার মেধা দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজে অর্থ উপার্জন করছে এবং অন্যদের জন্য কর্মক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এ সকল কাজ ইন্টারনেটে অনেক সাইটে পাওয়া যায়। এর মধ্যে জনপ্রিয় কয়েকটি হলো ওডেস্ক (www.odesk.com), ফ্রিল্যান্সার (www.freelancer.com), ইল্যান্স (www.elance.com) ইত্যাদি। অবশ্য যারা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করে তাদেরকে বলা হয় ফ্রি-ল্যান্সার।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্ভাবনাগুলো দল গঠনপূর্বক আলোচনা করে উপস্থাপন করুন।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে আইসিটির বহুমুখী প্রভাব ও ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই প্রভাব ও পরিসর ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারের ফলে কর্মীদের দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা বেড়েছে। অন্যদিকে এর ফলে সেবার মানও উন্নত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কর্মক্ষেত্রে আইসিটির কয় ধরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়?

ক. দুই ধরণের খ. তিন ধরণের
গ. চার ধরণের ঘ. পাঁচ ধরণের

২. বর্তমানে চাকুরি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনটি ব্যবহারে দক্ষতা একটি প্রাথমিক যোগ্যতা হিসেবে ধরা হয়?

ক. ফেসবুক খ. মোবাইল
গ. আইসিটি ঘ. টুইটার

৩. দেশের অর্থনীতির চাকাকে বেগবান করার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে?

ক. ফেইসবুক খ. গুগল
গ. আউটসোর্সিং ঘ. ই-মেইল

পাঠ-১.৬ সামাজিক যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ব্লগিং, ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টুইটার।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে সারা দুনিয়ার মানুষ এখন একই প্লাটফর্মে দন্ডায়মান । পৃথিবীর এক প্রান্তে ঘটে যাওয়া যে কোন ঘটনা এক ন্যানো সেকেন্ডে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে । সারা বিশ্বের মানুষ পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বসবাস করছে। তাই বিনোদন, যোগাযোগ, বন্ধু সৃষ্টি ও সংবাদ প্রচার ইত্যাদি সামাজিক ওয়েব সাইটের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এভাবে সামাজিক ওয়েব সাইটগুলো বিশ্বগ্রামের সকল মানুষের মধ্যে এক আন্ত:যোগযোগ তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম আলোচনার বিষয় হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট। এই সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট হলো এক ধরনের ওয়েবসাইট যেখানে বন্ধুত্ব তৈরির পাশাপাশি, বার্তা বা বিভিন্ন সংবাদ আদান-প্রদান, অডিও ভিডিও ইত্যাদি আপলোড বা ডাউনলোড করা যায়। আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে পরিচিত মানুষের সাথে বিশেষভাবে যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ওয়েব সাইট যেমন-ফেসবুক, টুইটার, অরকুট, স্কাইপি, ফ্লিকার, মাইস্পেস, ডিগ, ইউটিউব, ডায়াসপোরা ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট বেশতো ডটকম (www.beshto.com) ২০১৩ সালের ২৮ ফ্রেব্রুয়ারি চালু হয়। অবশ্য সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় দুইটি মাধ্যম হলো ফেসবুক ও টুইটার।

ফেসবুক : ফেসবুক সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন একটি ওয়েবসাইট যেখানে বন্ধুত্ব তৈরির পাশাপাশি, বার্তা বা বিভিন্ন সংবাদ আদান-প্রদান, অডিও-ভিডিও ইত্যাদি আপলোড বা ডাউনলোড করা যায়। এই ফেসবুকের ওয়েব অ্যাড্রেস হলো www.facebook.com । এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। মার্ক জুকারবার্গ ও তার চারজন বন্ধু মিলে পরীক্ষামূলকভাবে এটি তৈরি করেন। কিন্তু পরবর্তীতে এটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিনামূল্যে যে কেউ ফেসবুকের সদস্য হতে পারে। ব্যবহারকারীগণ বন্ধু সংযোজন, বার্তা প্রেরণ, তাদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি প্রকাশ, আদান-প্রদান ও হালনাগাদ করতে পারেন। এছাড়া এতে ছবি, অডিও ও ভিডিও প্রকাশ করা যায়। ফেসবুকে যে কোন প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব পেজ খুলে তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন দিতে পারে, অনলাইনে পণ্য বিক্রি করতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ২০০ কোটি ফেসবুক ব্যবহারকারী রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশেরও অসংখ্য ব্যবহারকারী রয়েছে।

টুইটার : বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগের আরেকটি জনপ্রিয় মাধ্যম হলো টুইটার; যার ওয়েব অ্যাড্রেস হলো www.twitter.com। ফেসবুকের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য হলো এটিতে ব্যবহারকারীদের সর্বোচ্চ ১৪০ অক্ষরের মধ্যে তাদের মনোভাব প্রকাশ ও আদান-প্রদান করতে হয়। এজন্য এটিকে মাইক্রোব্লাগিংয়ের একটি ওয়েবসাইটও বলা হয়। ১৪০ অক্ষরের এই ক্ষুদ্র বার্তাকে বলা হয় টুইট (Tweet)। সাধারণত টুইটারের সদস্যদের টুইট বার্তাগুলো তাদের প্রোফাইল পাতায় দেখা যায়। টুইটারের সদস্যের অন্য সদস্যেদের টুইট পড়ার জন্য সেই সদস্যকে অনুসরণ বা follow করতে হয়। কোন সদস্যকে যারা অনুসরণ করে তাদেরকে follower বা অনুসারী বলা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	দলীয়ভাবে সামাজিক যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ বলতে ভার্চুয়াল যোগাযোগ ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মানুষে মানুষে মিথস্ক্রিয়াকেই বোঝায়। ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগের জন্য অনেক প্ল্যাটফর্ম গড়ে উঠেছে, যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় দুইটি মাধ্যম হলো ফেসবুক ও টুইটার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে -

i. সহজ
ii. সাশ্রয়ী
iii. নিরাপদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২. জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কোনটি?

ক. ফেসবুক খ. গুগল
গ. জিমেইল ঘ. ইয়াহু

৩. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক কবে চালু হয়?

ক. ২০০২ সালে খ. ২০০৩ সালে
গ. ২০০৪ সালে ঘ. ২০০৬ সালে

৪. টুইটার কি?

ক. ব্যবসায়িক যোগাযোগ মাধ্যম খ. রাজনৈতিক যোগাযোগ মাধ্যম
গ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ঘ. অসামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

পাঠ-১.৭ ডিজিটাল বাংলাদেশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ডিজিটাল প্রযুক্তি, ডিজিট, ফাইবার অপটিক, ই-সেন্টার।

আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই যুগে প্রতিদিন নতুন নতুন তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। মানুষের জীবন এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর। ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে মূলত একটি উন্নত, বিজ্ঞানমনস্ক সমৃদ্ধ বাংলাদেশকে বোঝায়। প্রকৃত পক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে সেই সুখী, সমৃদ্ধ, দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত বৈষম্যহীন জনগণের রাষ্ট্র; যার মুখ্য চালিকাশক্তি হবে ডিজিটাল প্রযুক্তি।

বর্তমান সরকার ২০০৮ সালে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অর্থাৎ স্বাধীনতার ৫০ বছরে ২০২১ সালে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যই হলো বাংলাদেশ বিশ্বের একটি উন্নত দেশ হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণের জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর জীবনধারা গড়ে তুলে পুরো জাতির জন্য একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এটি একাত্তরের স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের রূপকল্প।

ডিজিট শব্দটির অর্থ সংখ্যা বা অংক। অংক বা ডিজিট ব্যবহার করে সংখ্যা পদ্ধতি প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ কোন সংখ্যা পদ্ধতি লিখে প্রকাশ করার জন্য যে সমস্ত সাংকেতিক চিহ্ন বা মৌলিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে অঙ্ক বা ডিজিট (Digit) বলে। যেমন- বাইনারি সংখ্যাকে প্রকাশ করার জন্য দুইটি অংক ০ এবং ১ ব্যবহার করা হয়। অংক বা ডিজিটের সংখ্যা হল মোট ১০ টি। যথা-০,১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ ইত্যাদি। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ ডাটা প্রক্রিয়াকরণ বা ডাটা সংরক্ষণের কাজ করা হয় বিভিন্ন প্রকার ডিজিটাল সংকেতের মাধ্যমে। ডিজিটাল সংকেত বলতে অনেকগুলো ডিজিটের সমন্বয়ে গঠিত সংখ্যা বা রাশিমালাকে বুঝায়। ডিজিটাল সংকেতকে বাইনারী ০ এবং ১ দ্বারা বিভিন্ন ভাবে ভোল্টেজের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

শুধুমাত্র ''কম্পিউটার প্রস্তুত দেশ'' হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। মূলত ডিজিটাল বাংলাদেশ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র মোচন এসব অঙ্গীকার ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা। এজন্য দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেয়া অতিব প্রয়োজন। দেশের প্রতিটি অঞ্চলে তার (ক্যাবল) বা তারবিহীন পদ্ধতিতে ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় যুক্ত করতে হবে। দেশের সব অঞ্চলের ডিজিটাল পদ্ধতিতে পারদর্শী জনগণকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে গণ্য হবে। এছাড়াও জনগণের সাথে সরকারের সংযুক্তি, জনগণের নিজস্ব সংযুক্তি, সরকারের ডিজিটাল রূপান্তর, শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর, সিভিল সার্ভিস ,মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে এবং এবং দৈনন্দিন জীবনে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অগ্রাধিকার হিসেবে গণ্য করতে হবে ।

আমাদের দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার অন্যান্য দেশের তুলনায় একটু দেরিতে শুর হয়েছে। তাই আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগে অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে আছি। তবে আশার বাণী হলো কোন দেশ বা জাতির তথ্য ও যোগাযোগি প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকলে সব সময় তাদের পিছিয়ে থাকতে হয় না। সঠিকভাবে এর প্রয়োগ

করতে পারলেই এগিয়ে যাওয়া যায়। তাই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক গুরুত্ব দিতে হবে।

অবশ্য বর্তমানে বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। সরকারিভাবে সারা দেশে ফাইবার অপটিক ক্যাবলের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে টেলিফোন বা মোবাইল ফোনের ব্যবহারকারী। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারিভাবে চালু হয়েছে ই-সেবা, ই-পর্চা সেবা, ই-পূর্জি সেবা ইত্যাদি। আবার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলের জনগণের কাছে সেবা পৌঁছানোর জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে চালু হয়েছে ইনফরমেশন সার্ভিস সেন্টার, পোস্ট অফিসগুলোকে ই-সেন্টারে রূপান্তরিত করে মোবাইল মানি অর্ডারের সুযোগ, শিক্ষা ব্যবস্থায় অনলাইনে ভর্তি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল জানা, এমনকি অনলাইনের মাধ্যমে চাকুরির জন্য আবেদন করা ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনবল। আর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবলের জন্য প্রয়োজন যথার্থ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও এখাতে সরকারিভাবে অর্থায়ন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। ই-গভর্ন্যান্স এর মাধ্যমে দেশের সরকারিসহ অন্যান্য কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে। তাহলেই বাংলাদেশ প্রকৃত ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠারই হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে সেই সুখী, সমৃদ্ধ, শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বৈষম্য, দুর্নীতি, দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ, যা প্রকৃতপক্ষেই সম্পূর্ণরূপে জনগণের রাষ্ট্র এবং যার মুখ্য চালিকাশক্তি হবে ডিজিটাল প্রযুক্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কত সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিকল্পনা করা হয়?

ক. ২০০২ সাল খ. ২০০৪ সাল
গ. ২০০৬ সাল ঘ. ২০০৮ সাল

২. কত সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়?

ক. ২০১৮ সালে খ. ২০২১ সালে
গ. ২০২৩ ঘ. ২০২৫ সালে

৩. ডিজিট শব্দের অর্থ কি?

ক. গণনা খ. সংখ্যা
গ. সংখ্যক ঘ. গাণিতিক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইলেকট্রনিক বিনিময় প্রথার মাধ্যমে বাণিজ্য করাকে কী বলা হয়?

ক. ই-সার্ভিস খ. ই-কমার্স
গ. ই-গভর্ন্যান্স ঘ. ই-লার্নিং

২. ইএমটিএস পদ্ধতিতে ১ মিনিটে সর্বোচ্চ কত টাকা পর্যন্ত পাঠানো যায়?

ক. ৪০ হাজার খ. ৫০ হাজার
গ. ৬০ হাজার ঘ. ৭০ হাজার

৩. দেশের সকল জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইনে সংগ্রহ করাকে কী বলে?

ক. ই-পর্চা খ. ই-পূর্জি
গ. ই-স্বাস্থ্যসেবা ঘ. ইমটিএস

৪. টুইটারে সর্বোচ্চ কত অক্ষরের মধ্যে বার্তা পাঠাতে হয়?

ক. ১২০ অক্ষর খ. ১৩০ অক্ষর
গ. ১৪০ অক্ষর ঘ. ১৫০ অক্ষর

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. ই-কমার্স বলতে বোঝায়-

i. ইন্টারনেটে যোগাযোগ
ii. ইন্টারনেটে ব্যবসা বাণিজ্য
iii. মুক্ত বাজার ব্যবসা বাণিজ্য
নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. শিক্ষাক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্সের ফলে সম্ভব হয়েছে-

i. ইন্টারনেটে এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল
ii. মোবাইলে এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল
iii. কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন
কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দিপকটি পড়ুন ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন:

নিলয় অন-লাইনের মাধ্যমে এমবিএ ডিগ্রী অর্জন করেছে। তার কিছু বন্ধু কানাডাতে পড়াশুনা করে। সে তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। পড়াশুনা শেষ করে প্রযুক্তির কল্যাণে নিলয় ঘরে বসেই অর্থ উপার্জন করছে। অন্যদিকে তার বন্ধু মাহমুদও প্রযুক্তির কল্যাণে যে কোন স্থান হতেই তার ব্যবসায়িক কাজ সম্পন্ন করতে পারছে।

৭. নিলয়ের অর্থ উপার্জনের সিস্টেমটি হল-

ক. ই-কমার্স খ. আউটসোর্সিং
গ. ভিডিও কনফারেন্সিং ঘ. হ্যাকিং

৮. মাহমুদের ব্যবহৃত সিস্টেমটির সাথে সম্পর্কিত শব্দ হলো-

i. ডেভিড কার্ড
ii. ক্রেডিট কার্ড
iii. আইডেন্টিটি কার্ড
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ ঃ ১. খ ২. ক ৩. গ ৪. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ ঃ ১. খ ২. গ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ ঃ ১. ক ২. ঘ ৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪ ঃ ১. ঘ ২. গ ৩. গ ৪. খ ৫. খ ৬. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫ ঃ ১. ক ২. গ ৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৬ ঃ ১. ঘ ২. ক ৩. গ ৪. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৭ ঃ ১. ঘ ২. খ ৩. খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১ খ ২ খ ৩ ক ৪ গ

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৫ গ ৬ ঘ

গ. অভিন্ন বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৭ খ ৮ ক